অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার : নূতন সূচনার পটভূমি

ইউরোপে শিল্পবিপ্লব পরবর্তী ধনতন্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার ফলে উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল। বাংলাসাহিত্য ও সমাজের নবজাগরণের মূলে রয়েছে ইউরোপ। উনবিংশ শতকে সমাজে ও সাহিত্যে, কর্মে ও মননে বাঙালি যে নিজেকে প্রকাশিত করতে পেরেছিল তার মূল কারণ ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আর তা শুধু প্রশাসনিক সংযোগ নয়, এ সংযোগ ঘটেছে বাঙালির চিত্তলোকে। এর ফলে উনিশ শতকে বাংলাদেশে চিন্তা চেতনা, জীবনবোধ, সাহিত্য সবক্ষেত্রেই এক নূতন মূল্যবোধে আবিষ্কৃত হয়। নূতন যুগের সূচনা হয়। এর ফলে মধ্যযুগের সামন্তসমাজের গড়ন ভাঙতে শুরু করে। মধ্যযুগীয় শ্রেণীবিন্যাসেও পরিবর্তন দেখা দেয়। মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণীবিচারের প্রধান মানদণ্ড বংশ কৌলীন্যের স্থলে বিত্তকৌলীন্যের উদ্ভব ঘটে। তবে বাংলাদেশে বড়ো রকমের কোনো আর্থসামাজিক পরিবর্তন না হ'লেও (এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি) মধ্যযুগীয় জীবনের স্থবির পিরামিডকে তা বিনষ্ট করে, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

সমাজে সচেতন এবং আপন ব্যক্তিত্বে আস্থাবান এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে স্বদেশের দীনতার মূর্তিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর তার ফলস্বরূপ সর্বত্র দেখা দিয়েছিল এক ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোগ। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত এদেশীয় সংস্কারকদের কাছে স্বদেশীয় নারীর অসহায় লাঞ্ছিত রূপটা তখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। যার পরিণাম সতীদাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বা বহুবিবাহরোধ আন্দোলন। জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতির স্বার্থে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনও গভীরভাবে অনুভূত হয়। উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগ্রত এই জীবনবোধ শুধু সমাজেই নয়, সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে মানুষের আত্মাবমাননা ও দেবতার জয় ঘোষনাই ছিল প্রথম ও শেষ কথা। কিন্তু নবজাগরণের ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ঘটে। এর ফলে আত্মঅবমাননার পরিবর্তে আত্মসম্মান, দৈবানুগ্রহের পরিবর্তে আপন শক্তির ওপরে মানুষ আস্থাশীল হয়ে ওঠে। আর সাহিত্যেও তা মূর্ত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে সাহিত্যের লালনক্ষেত্র ছিল রাজদরবার। নগরজীবনের বিকাশে, মধ্যবিত্ত চেতনার স্ফুরণে, সর্বোপরি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সাহিত্য রাজসভা থেকে জনসভায় স্থানান্তরিত হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেতনায় সাহিত্যও হ'য়ে ওঠে মানবজীবনাশ্রয়ী।

সমাজের এই পটভূমিতে সাহিত্যেরও বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন-ধারার জোয়ার আসে। একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এই ধারাগুলো অগ্রসর হ'তে থাকে। যেমন অনুবাদ ও মৌলিক নাট্যরচনার ধারা, নূতন কাব্য রচনার ধারা, নক্শা ও ব্যঙ্গকৌতুকের ধারা, প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থের গদ্যানুবাদের ধারা। গদ্যকে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যে উপন্যাস হ'লো একটি অন্যতম প্রধান ধারা। আর এই উপন্যাস আবির্ভাবের পটভূমি প্রস্তুতির আলোচনাই আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়বস্তু।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গদ্যরীতির যে স্তরে স্তরে অগ্রগতির সোপানে আরোহন করেছে - এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে একদিকে পন্ডিতী বাংলার ধারা উদ্ভূত হয়েছে, আবার তার পাশাপাশি কথ্য বাংলার ধারাও ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকেই কথ্য গদ্যরচনার ক্ষীণধারার প্রবর্তন হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্র্যে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বস্তুত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসকে কেন্দ্র করেই বাংলা গদ্যে প্রথম গল্পমূলক রচনা প্রকাশ পায়। এই পাঠ্যপুস্তক-গুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসী এবং ইংরেজি রচনার সারানুবাদ বা ভাবানুবাদ। উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে একদল বাঙালি সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এসমস্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

এঁদের সম্মুখে কোনো আদর্শ বাংলা গদ্যরীতিও ছিলনা। তাছাড়া এসমস্ত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা এবং পাঠকও ছিল সীমিত। গদ্যগ্রন্থের মতো প্রয়োজনের তাগিদেই প্রকাশিত হয় সাময়িকপত্র। সাময়িকপত্রের আন্দোলন পাঠক সংখ্যার বিস্তার ঘটায়। সংবাদপত্রে পরিবেশিত ঘটনাসূত্রে নবনব চিন্তার উদ্রেকের ফলে সচেতন পাঠকমনে সজীব গদ্যবোধের সৃষ্টি হয়। আমরা দেখেছি সংবাদপত্রের বিভিন্ন স্তরে একদিকে তথ্য ও বক্তব্য প্রধান রচনারীতির শক্তিশালী রূপটি গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে লক্ষণীয় পাঠকমনে রসাবেদন সৃষ্টির প্রয়োজনে কথাসাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র উপাদান টুকরো টুকরো সংবাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

তবে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের গদ্যভাষার তুলনায় সংবাদপত্রের গদ্যভাষা পাঠকের অনেক বেশি কাছের হয়ে ওঠে। অনেক বেশি অর্থবোধকও হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের গদ্য দৈনন্দিন জীবনের বিষয় হওয়ায় এ গদ্যে সমসাময়িক জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়। পত্র পত্রিকার মাধ্যমেই বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাগদ্যের যোগ ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে।

আবার অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলায় গদ্যরচনার ধারাটি বিকশিত হ'তে থাকে। রামমোহনের গ্রন্থগুলি ধর্মীয় বাদানুবাদ এবং সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। তিনি দেশের যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে বাঙালির প্রাচীন শাস্ত্রবচনকেই শত্রুর বিরুদ্ধে শস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত রামমোহন প্রতীচ্যের দর্শণ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ আত্মস্থ করেছিলেন। নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে নবযুগের প্রথম মানুষ হিসেবে স্বদেশীয় পুরাতন জ্ঞানরাজি দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তাঁর এই সমস্ত রচনা পাশ্চাত্যের চিহ্নবহনকারী নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের আলোকে সবকিছুকে দেখবার নবজাগৃতিসুলভ প্রয়াস রামমোহনের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর পেছনে পাশ্চাত্য চিন্তাজগৎ অবশ্যই সক্রিয় ছিল।

রামমোহনের উত্তরসূরী বিদ্যাসাগরের হাতেই সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত হয়। গদ্যরীতির ক্রমবিবর্তনে তাঁর হাতেই বাংলা গদ্য একটি সৌষ্ঠবময় রূপ লাভ করে। তাঁর পরিকল্পিত সাধুভাষাই পরবর্তীকালে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মাধ্যম হয়েছে।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় গল্পমূলক রচনার ধারাটি বিকশিত হ'তে থাকে। অবশ্য অনুবাদাশ্রয়ী রচনার বিষয়বস্তু সমসাময়িক কালের নয়। তা অপরিচয়ের দূরত্ব দিয়ে ঘেরা এবং বাঙালি জীবন বহির্ভূত। এর ফলে বাংলাগদ্য জীবনানুসারী হয়ে ওঠেনি। তবে অনুবাদের তাগিদেই ক্রমশঃ তা বিষয়ানুসারী হয়ে ওঠে। আবার অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষা একদিকে সমৃদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে বাংলা ভাষার বিষয়দৈন্য ঘুচেছে। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ধারাকে আত্মসাৎ করে বাংলা গদ্য ক্রমশঃ সাহিত্যরসপুষ্ট হয়েছে। তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'রাসেলাস', 'কাদম্বরী', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ', 'বিচিত্রবীর্য্য', 'পোলবর্জিনী', গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাহিত্যধর্মী কাহিনীর ধারাটিও পুষ্ট হয়েছে।

অবশ্য অনুবাদাশ্রয়ী রচনার পাশাপাশি মৌলিক রচনার একটি ক্ষীণধারা প্রথমাবধি বহমান ছিল। বিদ্যাসাগরের হাতে শিল্পসম্মত সাহিত্যিক গদ্যরীতিরও উদ্ভব হয়। উপন্যাস সাহিত্যিক গদ্যের অন্যতম একটি শাখা হ'লেও শুধু গদ্যের উদ্ভবই উপন্যাস সৃষ্টির একমাত্র শর্ত নয়। উপন্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় দেশকালের পরিস্থিতি, জীবনবোধ এবং উপন্যাসের শিল্পভাবনা সম্মুখে প্রত্যয়। ঔপন্যাসিক জীবনকে দেখেন গভীরভাবে। তিনি যে সমাজে বাস করেন, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোন দিয়ে সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তার রচনায় তা প্রতিফলিত করেন। উপন্যাসে তাই যুগসত্য রূপায়িত হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে পরিশেষে আমরা প্রথম বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ সন্ধানে অগ্রসর হচ্ছি। প্রথম বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করেছি। কিন্তু সব অভিমতকেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারিনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের অভিমতের পুনর্বিচারের প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছে। বস্তুত উপন্যাস হ'লো লেখকের অভিজ্ঞতা নির্ভর সামাজিক নরনারীর জীবনের শিল্পিত বিন্যাস। আর এই বিন্যাসে থাকে নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের প্রাধান্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে উন্মেষপর্বের রচনাগুলোর গুরুত্ব

অনুধাবন করে বাংলা উপন্যাসের উন্মেষের প্রতি আলোকপাত করা যাক।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সমসাময়িক বাঙালি জীবনভিত্তিক কাহিনী রচনা করেন। 'বাবুর উপাখ্যান', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি তাঁর সমকালাশ্রয়ী রচনা। সমকালীন সমাজজীবনের অসঙ্গতির চিত্র বিবৃতির মাধ্যমে লেখক এগুলোতে পরিবেশন করেছেন। তবে অনেকেই তাঁর 'নববাবুবিলাস (১৮২৩)কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদায় ভূষিত করতে চান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - " নববাবুবিলাস প্রথম উপন্যাসের গৌরবদাবি করে।" [১] আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন - নববাবুবিলাস এবং নববিবিবিলাস থেকেই "প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের সূচনা হইয়াছে।" [২] কিন্তু 'নববাবুবিলাস'এর আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি ব্যক্তিচরিত্রের স্ফুরণ নয়, বাবুসমাজের প্রতিবেশ রচনাতেই তিনি মনোযোগী হয়েছেন। বাস্তব ও স্বাভাবিক বিচারে নরনারীর দাম্পত্যজীবনের পরিচয় এতে নেই, যদিও তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তাছাড়া এর ভাষাও প্রাঞ্জল হ'য়ে ওঠেনি। বস্তুত লেখক সমাজ সংস্কারকের মনোভাব নিয়ে এই সমস্ত গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। ফলে জীবনরস স্পন্দিত আখ্যান রচনা তাঁর লক্ষ্য ছিলনা। তবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে সামাজিক চিত্র অঙ্কনের প্রচেষ্টায় ভবানীচরণ বাংলাসাহিত্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'নববাবুবিলাস' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত বলে স্থানকাল-পাত্রের পরিচয়বহ। পরবর্তীকালে সামাজিক চিত্র ও উপন্যাস রচনার পূর্বসূরী হিসেবে তাঁর নববাবুবিলাস ও 'নববিবিবিলাসে'র ক্ষীণতম হ'লেও একটা আবেদন আছে।

ভবানীচরণের পরবর্তীকালে সামাজিক নক্শা সৃষ্টির এই ধারার কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'(১৮৬২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের সকলস্তরের মানুষের ছবিই এতে লক্ষণীয়। কালীপ্রসন্ন বাঙালির মূঢ়তা, ভণ্ডামির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেও প্রকৃতপক্ষে বাবুসমাজের কদর্যতার বাস্তবচিত্রটি অঙ্কিত করেছেন তাঁর নক্শায়। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সমাজের দৃশ্যপটকে লেখক তাঁর নক্শায় তুলে ধরেছেন। এ-বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে তার নক্‌শায় একক কোনো কাহিনী নেই, নেই কোনো ব্যক্তি-চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস। কিন্তু তার নক্‌শার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, বিষয়বস্তুও তেমনি উপন্যাস সৃষ্টির উপযোগী। তবে তিনি উপন্যাসোচিত কৌশল অবলম্বন করেননি। অবশ্য তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করতেও চাননি। তা সত্ত্বেও তাঁর নক্‌শা সামাজিক উপন্যাসের পটভূমি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

হানা কাথেরীণ ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'(১৮৫২) গ্রন্থটিকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদাদানে উৎসুক।[৩] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্যও গ্রন্থটিকে বাংলার প্রথম উপন্যাস রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন।[৪] কিন্তু লক্ষণীয় গ্রন্থটি স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত। গ্রন্থের বিষয় বিশেষ কোনো মানবিক সমস্যা নয়। করুণার খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ ও খ্রীষ্টধর্মগ্রহণই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এর প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থের যত্রতত্র বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দানের ফলে রচনাটিকে যেমন প্রকাশ্যে প্রচারধর্মী করে তুলেছে, তেমনি গল্পরসের সুচ্ছতাও নষ্ট করেছে। তাছাড়া ডায়েরির আঙ্গিকে আখ্যান বিন্যস্ত অথচ প্রথমাবধি লেখিকার সক্রিয় উপস্থিতি উপন্যাসের আঙ্গিকগত ত্রুটিকেই সূচিত করে। প্রচারের দিকে লক্ষ্য থাকায় আখ্যানের চরিত্রসমূহের চলন বলন লেখিকাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। উপন্যাসের উপজীব্য প্রণয়-সুন্দরী চন্দ্রকান্তের পরিণয়ের মধ্যে একটু আভাষিত হ'লেও তা মূলধারার বহির্ভূত হওয়ায় বিষয়বিন্যাসে কোনোরূপ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থটিকে তাই উপন্যাস বলা যায় না। এটি মূলত খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারমূলক কাহিনী।

তবে গ্রন্থটি সরল সাধুভাষায় রচিত। তাছাড়া রচনাশৈলীতে ডায়েরির আঙ্গিক ব্যবহারের প্রচেষ্টা, প্রণয়ের স্বীকৃতি, লেখিকার অসতর্ক মুহূর্তে চরিত্রসৃষ্টিতে উপন্যাসোচিত গুণের প্রকাশ ইত্যাদি বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পথ নির্দেশ করেছে নিঃসন্দেহে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮)এর বিষয়বস্তু উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়বহ। বস্তুত গ্রন্থটি'প্রথম বাংলা উপন্যাস' হিসেবে সুপরিচিত। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাছাড়া লেখকও গ্রন্থটিকে প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস বলেছেন। তবে লক্ষণীয় সময়সাময়িক বিষয় অবলম্বনে রচিত হ'লেও কলকাতার নববাবুদের জীবনযাত্রার চিত্র রচনাই লেখকের লক্ষ্য ছিল। নীতির প্রশ্নে ও ঘটনাবাহুল্যে রচনাটির বিষয়গত ঐক্য ক্ষুন্ন হয়েছে। তাছাড়া মতিলালের পিতা বাবুরাম-বাবুর দ্বিতীয়বিবাহ, তাঁর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধাদির বিস্তৃত আলোচনা কাহিনীতে শিথিলতা এনেছে। ব্যক্তিচরিত্র ও নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবন পরিস্ফুটনের উৎস প্রেম এই রচনায় উপেক্ষিত। এখানে জীবনের রূপায়ণ বহিরঙ্গ নির্ভর। অন্তর্জীবন উদ্ঘাটিত হয়নি - যা উপন্যাসের শিল্পশৈলীকে ক্ষুন্নই করে। এর ফলে 'আলালের ঘরের দুলাল'এর বিষয়বস্তু সমসাময়িক হ'লেও তা জীবন রসসমৃদ্ধ হ'তে পারেনি। লেখকের আদর্শবোধের ফলে চরিত্রগুলোরও যথাযথ স্ফুরণ ঘটেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা লেখক উপন্যাসের শৈলী সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন না - এর প্রমাণ রয়েছে গল্পের রূপকথাধর্মী উপসংহারে। ফলে লেখক সমুৎ আগ্রহ ভরে উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হ'লেও তাঁর রচনাকে 'সম্পূর্নাঙ্গ' উপন্যাস বলা যায় না।

তবে তাঁর রচনায় উপন্যাসোচিত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কথ্যভাষার প্রয়োগে আখ্যানকে সংস্কৃতের ভারমুক্ত করার প্রচেষ্টা, ঘরোয়া কাহিনীর পরি-কল্পনা, সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ, টাইপচরিত্র সৃষ্টিতে নিপুণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর রচনায় উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক না হ'লেও তা উপন্যাসের পথ সৃষ্টি করেছে। বলাবাহুল্য সামাজিক ও পরিবারাশ্রয়ী উপন্যাসের ভিত প্রস্তুতিতে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'(১৮৫৯)এর আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় গ্রন্থটি নীতিশিক্ষাদান ও খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। 'চন্দ্রমুখীর

উপাখ্যানে'ও জীবনের বহিরঙ্গদিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। লেখক চন্দ্রমুখী ও হেমচন্দ্রের অন্তর্জীবনের সমস্যা রূপায়ণে অগ্রসর হননি। গ্রন্থের প্রথমে চন্দ্রমুখীর জীবনকথা প্রাধান্য পেলেও, খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচার লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ায়, গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত হ'তে পারেনি - যা উপন্যাসের আঙ্গিকগত ত্রুটির কথাই মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' উপন্যাস হয়ে ওঠে নি। তবে উপন্যাসের উন্মেষ পর্বে রচনাটির গুরুত্ব অবশ্যই আছে।

'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে'এ রাঢ়বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার অভিঘাতে ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মুখে বাঙালির জীবনবোধ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। এই আখ্যানে সে পরিচয় নিহিত আছে। এভাবে ধীরে ধীরে সামাজিক মানুষের পরিচয় সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। সমকালীন জীবন সম্পর্কে লেখকমনের এই কৌতূহলই উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করেছে। বস্তুত: এই শ্রেণীর আখ্যায়িকার পরিণতি সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাসে। বলাবাহুল্য এই পরিণতি স্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্রে। তাঁর 'বিষবৃক্ষ'ই(১৮৭৩) উচ্চাঙ্গের প্রথম সামাজিক উপন্যাস।

আবার ইতিহাসকে অবলম্বন করে আখ্যায়িকা রচনার প্রয়াসও প্রথম থেকেই লক্ষ করা গেছে। প্রথম দিকের এরূপ আখ্যানের নিদর্শন হিসেবে রামরামবসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (১৮০১) উল্লেখ করা যায়। তবে এতে প্রতাপাদিত্যের বংশ পরিচয়ের পর তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কাহিনীর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীর মিশ্রণ রয়েছে।[৫] এটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, উপন্যাস নয়। এই ধারায় গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' (১৮৬৩) উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন ইংরেজি উপন্যাসের প্রণালী অনুসারে গ্রন্থটি রচিত। কিন্তু তা অনুসরণের প্রয়াস থাকলেও 'বিজয়বল্লভ' মূলত রূপকথার ছাঁচে ঢালা। উপন্যাসোচিত চরিত্রাঙ্কনের প্রয়াসও লক্ষ করা যায় না। গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, রোমান্স। তবে বঙ্কিমের ওপরে যে গ্রন্থটির ক্ষীনতম হ'লেও একটা প্রভাব রয়েছে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি ভাষাগত দুর্বলতা ও আঙ্গিকগত ত্রুটি গ্রন্থটিকে উপন্যাসের কোঠায় উন্নীত করতে পারেনি। তবে কাহিনীর পরিবেশনে যেমন জড়তা নেই, তেমনি চরিত্রচিত্রণও সুষ্ঠু হয়েছে। প্রেম ও কর্তব্যের সংঘাতে রোসিনারার চরিত্রটি সুপরিস্ফুট। বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র(১৮৬৫) পূর্বে ইতিহাসকে অবলম্বন করে এর চেয়ে (অঙ্গুরীয় বিনিময়) সার্থক আর কোনো রচনা আমাদের চোখে পড়েনা। গ্রন্থটি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এ ভূদেব প্রথম বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর আমদানি করেছেন। আর এই পথেই সূচিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের জয়যাত্রা। তবে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর প্রভাব থাকলেও কাহিনী পরিবেশনে ও চরিত্রচিত্রণে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আত্মীকরণে গড়ে উঠেছে বাংলা উপন্যাস। তবে প্রতিটি সার্থক সৃষ্টির পূর্বে থাকে প্রস্তুতির পর্ব। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই প্রস্তুতির পর্ব আমরা লক্ষ করেছি। প্রাক্‌বঙ্কিমপর্বের কোনো কোনো রচনা গল্পরসসৃষ্টির দিক থেকে মৌলিকতা দাবি করলেও শিল্পশৈলীর বিচারে পরবর্তীকালের গল্পসাহিত্যের উপর কোনো স্থায়ী-প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা এই পর্বের চরিত্রসমূহে কোনো ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্র ঘটনা বা বক্তব্যের অধীন। নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো কোনো চরিত্র প্রতিনিধিমূলক হ'য়ে উঠেছে। উপন্যাস জাতীয় রচনার বিষয়বিন্যাসে জীবনঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় এই পর্বের রচনায় তা সুলভ নয়। তাছাড়া নীতিপ্রচার এই সমস্ত রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় নরনারীর মানবিক সত্তা ও অন্তরঙ্গ বিষয়সমূহও অপ্রকাশিত রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে উপন্যাসের শিল্পরীতি সম্বন্ধে লেখকদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল। উপন্যাসের পরিধির মধ্যে যে জীবনবোধ সংস্কারিত হয় - অভাব ছিল সেই জীবনবোধের।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্যে নবজীবনবোধকে সঞ্চার করেন। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস ও সাহিত্যের দেশাত্মবোধ ও রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কৌলীণ্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ফলে বাংলাদেশের সমাজজীবনে রোমান্টিক প্রেমের বিকাশ সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য জীবন-ধারার অভিঘাতে ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মুখে বাঙালির জীবনবোধ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে একদিকে কথাসাহিত্যের বাতাবরণ গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ দানা বাঁধে। সামাজিক প্রেক্ষা-পট যখন উপন্যাস রচনার অনুরূপ হয়ে উঠেছে, সাহিত্যক্ষেত্রে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বঙ্কিম পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস শিল্পের কৌশলটি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজসাহিত্যে রোমান্টিক প্রেমকে স্বীকার করতে চাইলেও তাঁদের মধ্যে দ্বিধার অন্ত ছিল না। ঔপন্যাসিককে সমাজ সচেতন হতে হয় বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই দ্বিধা ছিল। সেজন্যই তিনি নরনারীর জীবনে স্বাধীন প্রেম-বোধকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথম ইতিহাসকে অবলম্বন করেছেন। তবে যুগ সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বিধবার প্রণয়, পুনর্বিবাহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের সমাজে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, তাকে — প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ বিধবার প্রেম বিবাহ, বহুবিবাহ তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। সর্বগুণান্বিত মানবচরিত্র হতে পারেনা - বঙ্কিমচন্দ্র একথা জানতেন। এর ফলে জীবনে লাঞ্ছনা, রঞ্জনা, স্খলন, পতন, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, নিষ্ঠা - এই সমস্তকিছুর মূল্যই তাঁর উপন্যাসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত উপন্যাসই মানবচরিত্রের গভীর জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর।

উনিশ শতকে মানুষ সম্বন্ধে যে নূতন কৌতূহল সঞ্চারিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৌতূহলের বশেই মানবমনের তলদেশ পরিমাপে ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত

বাঙালির মনের প্রত্যাশাকে উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেজন্যই উনিশ শতকের নূতন উপলব্ধ রোমান্টিক প্রেম বঙ্কিম উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাঙালি সমাজে তখনও উপন্যাসের উপযোগী নায়িকা চরিত্রের অভাব দূরীভূত হয়নি। তাই সচেতন এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অভাবকে ইতিহাস ও রোমান্সের সাহায্যে পূরণ করেছেন। এবং মানবমনের জটিল রহস্যময় অবস্থা ও প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাছাড়া কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করে তিনি বিষয় বিন্যাস করেন। বিদ্যাসাগরী রীতির ভিত্তিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি গড়ে উঠেছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন।[৬] বস্তুত ভাষার মোহিনী-শক্তি লেখকমনের অন্তর্লীন রোমান্টিক চেতনাসঞ্জাত। বিদ্যাসাগরে এই প্রয়াস ছিল বহিরঙ্গ নির্ভর। বঙ্কিমচন্দ্রে তা অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গ্রথিত হয়। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাংলা কথা-গদ্য এই মোহিনীশক্তি অর্জন করতে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালির সংস্কারবদ্ধ জীবনবৃত্তে নারী ছিল গৃহবন্দী। নারীসত্তার জাগরণে ক্রমশ ক্রমে পরিবর্তন। বিষয়বস্তুও হয়ে ওঠে সংঘাত মুখর, জীবনানুসারী। আর একে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয় মানবজীবনের আলেখ্য উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এই আলেখ্যের রূপকার। তিনি সমকালীন নরনারীর অন্তরঙ্গ সমস্যা অবলম্বনে রূপায়িত করেছেন 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। সমসাময়িক নরনারীর প্রেমজ জীবনবোধকে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে এখানে রূপায়িত করেছেন। বালবিধবাকে কেন্দ্র করে নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব, অবদমিত কামনা, বাসনা, তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণ তথা অন্তর্জীবনের উদ্‌ঘাটনে কালৌচিত্য বোধের পরিচয়ও পাওয়া যায় 'বিষবৃক্ষ'এ। বাংলা উপন্যাসের আদিকর্মী হিসেবে এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনবত্ব।

কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বে নরনারীর এই জটিল সমস্যা সমাজে এমন প্রকটভাবে দেখা দেয়নি। তাছাড়া নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব থাকায় - লেখকের দৃষ্টিও পড়েনি

নারীসত্তার প্রতি। তাই তাঁরা সমাজের নানা কদাচার, অনাচার সৃষ্টিকারী রূপে নারীকে দেখেছেন। আর সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করতে গিয়ে প্রাক্‌বঙ্কিম পর্বের লেখকরা বহিরঙ্গ দিকের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন সমধিক। এর ফলে তাঁদের রচনা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তবে উপন্যাসের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এর ফলে ক্রমশঃ উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের উদ্যোগপর্ব বিশ্লেষণের শেষে আমরা আসলে একটি সমাজ নিয়ন্ত্রিত নান্দনিক উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হই। দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগের বার্তা বৃহত্তর পাঠক-সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই পর্বের আখ্যান প্রণেতারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কেবলই উপযুক্ত প্রকরণের সন্ধান করে গেছেন। ঔপনিবেশিক সমাজের যুক্তি শৃঙ্খলা দ্বারা তাঁদের চেতনা যদিও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ছিল, তবুও কখনো জ্ঞাতসারে, আবার কখনো অজ্ঞাতসারে তাঁরা অন্তেবাসী নারী এবং নিম্নবর্গীয়জনের নিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে বাণীরূপে দিতে চেয়েছেন। তবে সমাজ সংস্কারক বা ধর্মপ্রচারকের অবস্থান আর ঔপন্যাসিকের অবস্থান কখনোই এক হ'তে পারেনা। রচনার গভীর পরিসর ও সময়ের বোধও আলোচ্য রচনাগুলিতে খণ্ডিত। তাঁদের ভাষা, প্রকরণ বা আখ্যানসূত্র সমস্তই অসম্পূর্ণতায় আক্রান্ত। বাখতিন যাকে 'necessary multiplicity in human perception.'[৭] বলেন, দৃষ্টির সেই বহুত্ব ঐ সব উপন্যাসকল্প রচনায় একান্তই অনুপস্থিত। কিন্তু সমস্ত ত্রুটি এবং অপূর্ণতা নিয়েও এই উপন্যাসকল্প রচনাগুলিই প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাবকে নিশ্চিত করেছে। এই প্রক্রিয়ায় লেখকেরা বিভিন্ন লোকঐতিহ্য এবং আধুনিকতার উন্মেষপর্বে উত্থাপিত বিশিষ্ট (কাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত) রচনা প্রয়াস থেকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ পেয়েছেন। সুতরাং এই সমস্ত রচনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় উদ্যোগপর্বের সল্‌তে পাকানো যদি সুষ্ঠুভাবে না হ'তো তাহলে উপন্যাসের দীপমালা এতো মনোগ্রাহীভাবে জ্বলে উঠতো না।

সূত্রনির্দেশ

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.১৭

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ.২১১

৩। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৭, ভূমিকা

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪

৫। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৬৮, ভূমিকা, পৃ.৩

৬। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ.৮৮

৭। MICHAEL HOLQUIST Dialogism; Bakhtin and his World; Routledge; London, 1990, p.22.